‘আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে’

কোনো এক ছায়াছবির একটা গান ছিল এমন: ‘চোখের নজর এমনি কইরা একদিন ক্ষইয়া যাবে, জোয়ার-ভাটায় পইড়া দুই চোখ নদী হইয়া যাবে-এ, পোড়া চোখে যা দেখিলাম তাই রইয়া যাবে, হো-ও-ও’। আমার কৈশোরের শেষে এসে আগুনঝরা মার্চ, স্বাধীনতার ঘোষণা ও অর্জন সবটুকুই গভীরভাবে দেখেছি। সবকিছুই দুচোখ দিয়েই দেখছি। স্বাধীনতা এখন রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন হিসেবেও ব্যবহৃত হতে দেখছি। মাঝখানে দীর্ঘ ৫৩ টি বছর জীবন থেকে পেরিয়ে গেছে। আমার কর্মময় জীবনের পুরোটাই নদীর ঢেউয়ের উত্থান-পতনের মতো দেশের উন্নতি-অবনতির ঢেউ সচোক্ষে গুনছি। রাজনীতিকদের কাজকর্মের ভালো-মন্দ পর্যবেক্ষণ করছি। সবার ভালো-খারাপ আমলনামা (কর্ম-বিবরণী) চোখে চোখে ভাসছে। সত্যটা হলো, এদেশের মানুষ স্বাধীনতা শব্দটাকে বিজ্ঞাপন হিসাবে ব্যবহারের জন্য যুদ্ধ করেনি। এমনকি যুদ্ধ করে যে সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে, সে আশায়ও যুদ্ধ করেনি। এ ধরনের ভাবনা তখন কারো মাথায় স্বপ্নেও আসেনি। পরবর্তী সময়ে আমার জানা অনেকেই সার্টিফিকেটও কোনোদিন নেননি। তাদের অহংকার ছিল– আমরা সার্টিফিকেটের জন্য মুক্তিযুদ্ধ করিনি; আমরা দেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করেছিলাম। এদের অনেকে কথায় কথায় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত উদ্দেশ্যের কথাও তুলে ধরতেন। তাদের অনেকেই গত হয়েছেন। কিন্তু অর্জিত এই স্বাধীনতার মর্যাদাকে ব্যবহার করে কেউ রাজনীতির ব্যবসা ফেঁদে বসবে, এটা কোনোদিনই কেউ চাননি। দেশের স্বাধীনতা নিয়ে কোনো অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃশক্তির কারো কাছে আত্মমর্যাদা ও স্বাধিকার জলাঞ্জলি দিয়ে নতজানু হয়ে অন্যায় সহ্য করে বেঁচে থাকা যে কত কঠিন, তা প্রতিটা দেশপ্রেমী ব্যক্তি ভালো করে বোঝেন, এমনকি হৃদয় দিয়ে অনুভবও করেন। দলমত নির্বিশেষে এটা প্রতিটা দেশপ্রেমী লোকের মধ্যেই দেখে আসছি। তা এদেশের রাজনীতিকরা স্বার্থান্বেষী হয়ে খেয়ালখুশির বশে যে যাকে খুশি যতই কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি ও ধোয়া-মোছা করুক না কেন। এটা অনস্বীকার্য যে, যত নোংরামি, রাজনীতি (নেতিবাচক অর্থে), কারো না-কারো তাবেদারি, রাজনীতি নিয়ে ব্যবসা, ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠীস্বার্থ, মিথ্যা বচন প্রভৃতি সবই শুরু হয়েছে যুদ্ধে বিজয় অর্জন করার পর, যা এখনো অব্যাহত। নির্ভেজাল সত্য এই, এদেশের সকল অব্যবস্থা, দুর্নীতি, একদেশদর্শিতা, আশাহতের বেদনা ইত্যাদি ঘটে চলেছে রাজনীতির ছত্রছায়ায়। এত কথা দিয়ে গৌরচন্দ্রিকা দিচ্ছি মাসের নাম মার্চ বলে।

আমার সাথে রাজনীতিকদের একটাই বিরোধ, তাদের গঠনতন্ত্রে লেখা বক্তব্যের সাথে কাজ ও চিন্তার কোনো মিল নেই, তাই। তাদের চিন্তাধারা ও কর্ম এমনকি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের সাথেও মিল নেই। সে চিন্তা ও স্মরণ মাথায় না থাকলে কাজের সাথেই বা মিল হবে কী করে? সেজন্য জীবনভর কারো দলে ভিড়ে কারো শ্লোগানে অংশ নিতে পারলাম না, অথচ জীবনের জোয়ার-ভাটায় পড়ে ‘দুই চোখ নদী হইয়া’ গেল। ‘পোড়া চোখে যা দেখিলাম’ শুধু তাই-ই রয়ে গেল। নিজের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগানোর পরিবেশ পেলাম না; অনুদ্‌ঘাটিত রয়ে গেল বহুকিছু। সমাজটা যেন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেল।

মানুষের জন্য দেশ, মানুষের জন্যই সমাজ; দেশ ও সমাজ, এমনকি দেশ চালানোর জন্য যে সিস্টেম ও আদর্শ সবই মানুষের গড়ার কথা। সেই মানুষের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য যদি প্রকৃত মানুষের মতো না হয়, দেশ গড়ার উপযুক্ত না হয়; কীভাবে দেশ টিকে থাকবে? দেশ গড়ে উঠবে কীভাবে? ভিত্তি না থাকলে কল্পনার উপর ভর করে আকাশে অট্টালিকা গড়া যায় না। একটা শিশুকে অনেক কথা বিশ্বাস করানো যায়, পূর্ণাঙ্গ কোনো মানুষকেই নয়। মানুষকে উন্নতির বুলি মুখস্ত করাতে গেলে, তার অবচেতন মনে হলেও ভিত্তিমূল সে খুঁজবেই। গানের পরবর্তী কিয়দংশ ‘চোখেরি নাম আরশিনগর, একে একে মনের খবর, সে-তো কইয়া যাবে-এ, পোড়া চোখে...’। তাই যতটুকু পারা যায়, একটা পত্রিকাকে অবলম্বন করে কখনো প্রবন্ধ আকারে, কিংবা কখনো বই আকারে এই লেখালেখির অবতারণা। কোনো ব্যক্তি, কোনো গোষ্ঠী বা কোনো দেশের তাবেদারি করার জন্যও আমরা বেঁচে নেই। আমরা ‘চাটার দল’-এর কোনো অংশও

নই। কারো হুকুমের গোলাম হতেও চাইনে। অধিকার এটুকুই যে, 'জন্মেছি এই নদীর চরে আমি এদেশের সন্তান, শ্যামলা মাটি-মায়ের বুকে সইপাতি পরাণ, আমি এদেশের সন্তান।' বেঁচে আছি সাধারণ মানুষ স্বাধীনতার সুখ-সাচ্ছন্দ্য যতটা আশা করেছিল, তার কিয়দংশও যদি এদেশের কাউকে না কাউকে, কাথাও না কোথাও সাধ্যমতো দিয়ে যেতে পারি, সেজন্য। তা সাথে কেউ থাক, বা না থাক।

কয়েক বছর আগে পাসপোর্ট অফিস দালালমুক্ত করার অভিযানের কথা পত্রিকায় পড়েছিলাম। তার কিছুদিন পর বিআরটিএ অফিসেও দালাল মুক্তির অভিযান চালাতে দেখেছিলাম। বেশ ভালো কথা। আমার জানতে ইচ্ছে করে, ঐ জায়গাগুলো এখনও দালালমুক্ত অবস্থায় আছে কি-না? দালালমুক্ত না থাকলে কেন নাই? এত শুদ্ধি অভিযানের পরও দুর্নীতিবাজ ও দালাল আসে কোত্থেকে? সমস্যাটা কোথায়? কয়েকদিন আগে ঢাকার বেইলী রোডের এক আগুনে অনেক লোকের প্রাণনাশের খবর শুনলাম। দুর্বিপাকে আমাদের কাছের একজনের অপমৃত্যুকেও সহ্য করতে হলো। পরবর্তী সময়ে অসংখ্য হোটেল-রেস্টুরেন্টের দরজা সংশ্লিষ্ট বিভাগ তালাবদ্ধ করে দিয়েছে। বেশ ভালো খবর। সমস্ত অবৈধ হোটেল-রেস্টুরেন্ট তালাবদ্ধ হয়েছে তো? কেন অবৈধ সবগুলো তালাবদ্ধ হলো না? যতগুলো তালাবদ্ধ হলো পাইকারি হারে করা হলো, না বেছে বেছে করা হলো– এটার বিস্তারিত তো কোথাও লেখা দেখলাম না। আচ্ছা, এই যে প্রতিটা সেক্টরে অব্যবস্থা, এর তো কোনো রাখঢাক-গুড়গুড়ি নেই। পত্রিকা পড়লেই বোঝা যায় সবকিছুই অপেন-সিক্রেট হয়ে গেছে। সবকিছুতেই বড় বড় কথা বলা হয়, কাজের বেলায় ঠনঠনাঠন। এই নীতির নাম কী? এটা আবার কোন তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত? জানি, সরষের মধ্যে নাকি ভুত থাকে। তাহলে সব সরষের মধ্যেই কি ভুত আছে? থাকেই যদি, সে ভুত আমরা বিতাড়িত করি না কেন? অসুবিধা কোথায়? দেশ তলে তলে, কখনো প্রকাশ্য দিবালোকে দিনে দিনে উচ্ছনে যাচ্ছে, তাকিয়ে দেখতে কতক্ষণ ভালো লাগে!

কিছুক্ষণ আগে খবর পেলাম সুপ্রিমকোর্ট বার কাউন্সিলের নির্বাচনে এক দলের দু-গ্রুপের মধ্যেই মারামারি, সে এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। গতবারও তেমনটিই শুনেছিলাম। জীবনের প্রতিটা পর্যায়ে একই অবস্থা দেখছি ও শুনছি। এর মাজেজা ও হকিকত কী? দেশ নষ্ট হয়ে গেছে, সরকার নষ্ট হয়ে গেছে, না মানুষের মানসিকতা নষ্ট হয়ে গেছে? মানুষের মানসিকতা নষ্ট হয়ে গেলে তার আর থাকে কী? তাকে আর মানুষ বলা যায় কী! আমি মাস্টার মানুষ হওয়ায় অনেকের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আমার দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো নাও মিলতে পারে। আমাদের সমাজে কি বুনো আবহ বিরাজ করছে? এগুলো দেখেও আমরা না-দেখার ভান করি কেন? এতে কি প্রমাণিত হয় না যে, আমরা মোটের উপর দুর্নীতিপরায়ণ (সুনীতির অভাব) ও জিঘাংসাপ্রিয় মনোভাবে বিশ্বাসী। যারা সামাজিক এ দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতে পারছেন না, বা মেনে নিতে পারছেন না, তারা এদেশে খুব মানসিক কষ্টে দিনাতিপাত করে চলেছে, প্রতিটা পদে অপমানিত হচ্ছেন। তারা না পারছেন মাতৃভূমি ছেড়ে চলে যেতে, না পারছেন আত্মহত্যা করতে। কথাগুলো খোলামেলা বলাটাও ঝুঁকিপূর্ণ। আমার এ কথায় নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দল গোসসা করলে আমার প্রতি অবিচার করা হবে। এদেশের সব দলেরই একই অবস্থা। দেশটাই তো আমরা প্রায় পচিয়ে ছেড়েছি। খেটে খাওয়া মানুষ বাদে প্রায় সবারই তো একই অবস্থা। প্রতারকের সংখ্যাধিক্য ঘটেছে। মুখের কথার কোনো মূল্য নেই। এমনকি স্বাক্ষর করেও অস্বীকার করা হয়। আমি তো সমাজের যেখানেই যাচ্ছি একই বার্তা পাচ্ছি। আমি আমার নিজের চোখ ও কানকে অস্বীকার করি কী করে? এদেশের 'ঘরে ছুঁচোর কেত্তন, বাইরে কোচার পত্তন' অবস্থা। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের সহজ কোনো পথ নেই।

আমার স্কুল জীবন শুরু হয়েছিল 'পাক ছার জমিন ছাদ বাদ' দিয়ে। অর্থটাও জানতাম না। তারপর একসময় কিছুদিন এলো 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ'। পরে যখন সবশেষে এলো 'আমার সোনার বাঙলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন...'। তখন আমি হাই-স্কুলের শেষ পর্যায়ে। আমার কণ্ঠটা বরাবরই ভালো ছিল। আমাকে এসেম্বলির সামনে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীত গাইতে হতো। জাতীয় সংগীত গাইতে গিয়ে আমার বুকের ছাতি দুই ইঞ্চি

ফুলে উঠতো। সত্যি বলতে কি, এই দীর্ঘ তেপ্পান্ন বছরের ঘটনাপ্রবাহে বর্তমানে এসে কখনো কখনো জাতীয় সংগীত গাইতে হয় সত্য, কিন্তু বুকের ছাতি আর ফুলে ওঠে না। কেউ কি বলতে পারেন, কেন আর ফুলে ওঠে না? সবাই হয়তো আমাকেই দোষারোপ করবেন। এদেশের রাজনীতিকদের ভালো-মন্দ সবাইকেই মোটামুটি চিনে ফেলেছি। দেখতে দেখতে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তাদের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়েছি। আমাকে নৈরাশবাদীর দলে ফেলতে পারেন, আমি প্রতিবাদ করবো না। তেপ্পান্ন বছর তো ধৈর্য ধরার জন্য যথেষ্ঠ। আর কত!

দেশের বিভিন্ন সেক্টরে লোকদেখানো শুদ্ধি অভিযান প্রায়ই পরিচালনা করা হয়। রাজনীতিকদের মধ্যে বা প্রতিটা দলে আমাদের শুদ্ধি অভিযান পরিচালনা করা হয় না কেন? অসুবিধা কোথায়? সম্ভবত সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখায় পড়েছিলাম, 'কুইনাইনে জ্বর সারাবে, কিন্তু কুইনাইনকে সারাবে কে?' আসলেই তো! কুইনাইনের জ্বরে ধরলে আমাদের করণীয় কী? যুগের পর যুগ কি কুইনাইন জ্বরে কাতরাতেই থাকবে? বর্তমান অবস্থায় রোগের ট্রিটমেন্ট দুটো– একটি হলো রাজনীতি হতে দুর্নীতিবাজ ও সুবিধাভোগী লোকগুলোকে ছাটাই করা, আত্মপ্রবঞ্চকদের দূরে সরিয়ে দেওয়া, যাতে রাজনীতি প্রকৃত অর্থেই দেশসেবা ও জনসেবার কাজে নিয়োজিত হয়। আমার জানা মতে এবং এইচআরএম আমার ভালোমতো পড়া আছে বলে জানি, এদেশে এখনোও দেশসেবা ও জনসেবা করতে চায় এমন লোক অনেক আছেন। তারা এখন সমাজচ্যুত, এটা বলা যায়। অনুকূল পরিবেশ দিলে তারা দেশসেবায় নিযুক্ত হবেন। আমরা মানুষকে বিভক্ত করেছি, কে কোন দল করে– তার ভিত্তিতে। আসলে বিভক্তিটা করা প্রয়োজন, কার মধ্যে সততা, সুশিক্ষা ও ন্যায়নিষ্ঠা আছে কি নেই, এর ভিত্তিতে। আমরা লিখতে ও পড়তে পারে এমন সার্টিফিকেটধারীকে শিক্ষিত লোক বলি। আসলে বিষয়টা আদৌ তেমন নয়। যার মধ্যে জীবনমুখী শিক্ষা, মনুষ্যত্ববোধ শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষা– তিন ধরনের শিক্ষায় বিদ্যমান, তাকেই শিক্ষিত লোক বলা উচিত। অথচ আমরা এই সাধারণ সত্য থেকে যোজন দূরে সরে গেছি।

আমার এ মাস্টারি বয়ানে কারো বোধোদয় হবে বলে কি মনে হয়? আমার বিশ্বাস হয় না। 'ছুঁচোর গায়ে আতর মাখালে কি ছুঁচোর গায়ের গন্ধ কখনো যায়? মনে হয় না। জে-জের 'যে', জে-জবর 'যা', ত-ইয়া-যবর 'তাই'। 'যে যা তাই'। জীবনের শুরুতে সুশিক্ষা ও সামাজিক পরিবেশ না দিয়ে, মানুষরূপে না গড়ে অমানুষ বানালে তার জীবনটাই বৃথা এবং সে রাষ্ট্রের জন্য বোঝা হতে বাধ্য। জীবনের শেষ বিকেলে নিজের ভাবনাটা লিখে প্রকাশ করতে পারি, এদেশে এটাই আমার শান্ত্বনা। আমার বয়ান শুনে মানুষ দলে দলে ভালোমানুষে পরিণত হয়ে যাবে, এটা ভাবতে আমি দ্বিধান্বিত। অন্তত রাজনীতিকরা হবেন না, নিশ্চিত জানি। তাছাড়া, বানু মোল্লার সায়েরিটা এরকম, 'ছাগল ধরিয়া যদি বল কানে কানে, চরিতে না যেও বাবা ফলের বাগানে'। যদি সে প্রাণিটা প্রকৃত ছাগলই হয়, কারো সহি নসিহত কখনোই শুনবে না। দেশের বেশিরভাগ রাজনীতিক ও সমাজ কাউকে কুশিক্ষা দেবে আর মাস্টারসাহেবরা স্কুল-কলেজে সেই শিক্ষার্থীকে ঝুড়িভর্তি সুশিক্ষার অমিয় বাণী শুনিয়ে মানুষের মতো গড়ে তুলবে, এটা অবাস্তব চিন্তা বৈ আর কিছুই না। সেজন্য দেশে 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' দরকার; আমরা যাকে আইনের শাসন বলি। এদেশে তা কতটুকু আছে? লালনের ভাষায় বলতে হয়, 'চাঁদের গায়ে দাগ লেগেছে, আমরা ভেবে করবো কী? চাঁদের গায়ে...'।

(১৪ মার্চ '২৪, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদঃ অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ